daily sun
TRUE AND IMPARTIAL
Date: 30-07-2024 (Page: 10)

Target to produce 3.73 lakh tonnes of Aman rice in Jhenaidah

Delwar Kabir, *Jhenaidah*

The farmers in six upazilas of Jhenaidah district are set to produce 3.73 lakh tonnes of transplanting Aman (T-Aman) rice in the current season.

The Department of Agricultural Extension (DAE) has set a target to produce 3.6 tonnes on each hectare on an average, said the DAE sources.

Abdur Rauf of village Maharajpur of Jhenaidah sadar upazila, said he brought his three bighas (120 decimals) of land under the T Aman farming in the season against last season's 2.5 bighas. The farmer is expecting 24 to 26 maunds of paddy from each bigha. If he could minimize the irrigation cost, the plots might provide him a satisfactory profit, Abdur Rauf said.

Farmer Sailendra Nath Biswas of Kashinathpur area in Langalbandh of Shailkupa upazila, said the farmers are happy as they witnessed rainfall in the current month after a prolonged drought in the last couple of months. As the T Aman largely depends on rain, he is hoping of adequate rainfall in upcoming days, he added.

DAE sources of Jhenaidah Khamarbari said, till 29 July, the farmers brought 52,595 hectares of land under T-Aman farming which was above 50% of the target. Among them, 12,627 hectares in Jhenaidah sadar, 12,834 hectares in Kaliganj, 1,850 hectares in Kotchandpur, 16,970 hectares in bordering Moheshpur, 11,253 hectares in Shailkupa and remaining 2,060 hectares in Harinakundu upazila.

The farmers in the district produced 372,088 tonnes of rice in the last season while the average yield on each hectare was 3.56 tonnes, the DAE sources said.

Sasti Chandra Roy, DAE deputy director in Jhenaidah Khamarbari, said, the farmers started transplanting saplings in mid-July which will continue till 20 August. The recent rainfall has shown a ray of hope to the farmers for growing better paddy plants. Further, it will also reduce their irrigation cost which could help strengthening their socio-economic state partially. he said.

Sangbad Online
সংবাদ
প্রকাশনায় ৬০ বছর
তারিখঃ ৩০-০৭-২০২৪ (পৃঃ ০৬)

হাওর উন্নয়নে চাই সমন্বিত উদ্যোগ

হীরেন পণ্ডিত

হাওর বললেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে বিশাল জলরাশি

হাওর বললেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে বিশাল জলরাশি। বর্ষায় দুচোখ যেদিকে যায় শুধু পানি আর পানি। শুকনো মৌসুমে পানির পরিবর্তে মাঠজুড়ে ফসলের সমারোহ দুচোখ ভরিয়ে দেয়। হাওর অঞ্চলে ছয় মাস শস্যক্ষেত্র থাকে পানির নিচে আর গ্রামগুলো পানিতে ভেসে থাকে দ্বীপের মতো। এটা বর্ষাকালের চিত্র। ছয় মাস থাকে শুকনো গ্রীষ্ম মৌসুমে। এ সময় যত দূর চোখ যায় মাঠের পর মাঠ, সবুজের সমারোহ ঢেউ খেলে যায়।

হাওর অঞ্চল বলতে সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, নেত্রকোণা, কিশোরগঞ্জ ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া- এই ৭টি জেলার হাওর অঞ্চলকে বোঝায়। ইতিহাস থেকে জানা যায়, সমুদ্রবক্ষ থেকে জেগে উঠেছে হাওর। হাওর অঞ্চল মোট ৩৭৩টা। এসব হাওরের মধ্যে কিশোরগঞ্জে ৯৭টি, সিলেটে ১০৫টি, সুনামগঞ্জে ৯৫টি, মৌলভীবাজারে ৩টি, হবিগঞ্জে ১৪টি, নেত্রকোণায় ৫২টি ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ৭টি হাওর রয়েছে। হাওরবেষ্টিত অঞ্চলে রয়েছে ৩ হাজারের অধিক জলমহাল, যেখান থেকে বছরে আহরিত হয় প্রায় ৪ লাখ টন মাছ। বর্ষাকালে হাওর অঞ্চল ১০-৩০ ফুট পানিতে নিমজ্জিত থাকে। আবার বর্ষা শেষে হাওর অঞ্চলে শুকনা মৌসুমে বিভিন্ন ফসলের সমারোহ দেখা যায়।

হাওর উন্নয়নে চাই সমন্বিত উদ্যোগ। কৃষির বিষয়ে ধান চাষের বাইরে প্রাকৃতিক মাছের বড় একটি ক্ষেত্র এই হাওর। স্থায়ী কাঠামো তৈরি করে মাছ, ঝিনুক ও শৈবাল চাষ করা যায় কিনা- এর সম্ভাব্যতাও যাচাই করা প্রয়োজন। কৃষির বিকল্প খাত তৈরি করার মাধ্যমে এই অঞ্চলের মানুষকে বছরব্যাপী আয়-রোজগারের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। ধানের কথা বলতে গেলে দুর্যোগ থেকে বাঁচাতে আমাদের রয়েছে লবণ, খরা, বন্যাসহিষ্ণু ধানের জাত। তবে সময় এসেছে এই জাতগুলোর সহনশীল ক্ষমতা আবার পরীক্ষা করার।

প্রয়োজনে নতুন জাত উদ্ভাবন করতে হবে। আমাদের বিজ্ঞানী ও নীতিনির্ধারকদের সময় জয় করে চলতে হবে। যে কোনো বিপদের আগাম দিকটিও মাথায় রেখে এসব প্রযুক্তি মাঠপর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে। কার্তিকে মঙ্গা হতো দেশের উত্তরাঞ্চলে, সেটিকে কাটিয়ে ওঠা গেছে। একাধিক স্বল্পমেয়াদি ধানের জাত দিয়ে। ব্রি ধান-৩৩, ৩৯ ও বিনা ধান ৭-এগুলো আগাম জাতের স্বল্পমেয়াদি ধান। তা কার্তিক আসার আগেই কৃষক ঘরে তুলতে পারেন। নতুন জাতের এ ধানটি দিয়ে মঙ্গা জয় করেছেন স্থানীয় কৃষক।

এ সফলতা দেখিয়েছেন আমাদের ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা। হাওর অঞ্চলের জন্য স্বল্পমেয়াদি বোরো ধানের কোনো জাত আছে কিনা তা বের যায় কিনা তা দেখতে হবে। এক সময় এশটি ধান ছিল যার মেয়াদকাল লাগানোর পর থেকে কাটা পর্যন্ত ১৭০ দিন। পরে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট উদ্ভাবিত বিআর-২৮ ও ২৯ জাত বোরো মৌসুমের জন্য উফশী জাত হিসেবে চাষ করলেন কৃষক। বিআর-২৮ লাগানোর পর থেকে ১৪০ দিন এবং ১৬০ দিনে বিআর-২৯ ফসল কাটা যায়।

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট হাওরের আগাম বন্যার কথা ভেবে নতুন ধানের জাত নিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন। প্রাকৃতিকভাবে গড়ে ওঠা দেশের বিস্তীর্ণ হাওর অঞ্চলে বসবাস করতে গিয়ে জনমানুষ নানাভাবে হাওরের স্বাভাবিক প্রবাহ বাধাগ্রস্ত করছে। অন্যদিকে সমন্বয়হীন অপরিকল্পিত উন্নয়ন কর্মকাণ্ড হাওরের জীববৈচিত্র্যের জন্য হয়ে উঠছে হুমকিস্বরূপ। উন্নয়নের নামে হাওরের স্বাভাবিকতা নষ্ট করা যেমন যাবে না, তেমনি হাওরের মানুষকে উন্নয়নের মূল স্রোত থেকে দূরে রেখে টেকসই উন্নয়ন সম্ভব হবে না। তাই হাওরের জন্য ভাবতে হবে অন্য রকম করে। কীভাবে হাওরের প্রাকৃতিক পরিবেশ অক্ষুণ্ন রেখে মানুষকে উন্নয়নের ধারায় যুক্ত করা যায়, এজন্য নিতে হবে সুপরিকল্পিত ও সমন্বিত উদ্যোগ এবং টেকসই উন্নয়নের বিষয়টি মাথায় রেখে এগোতে হবে সবাইকে।

প্রযুক্তিনির্ভর কৃষি ছাড়া বর্তমানে আমাদের টিকে থাকা কঠিন। কৃষি প্রযুক্তি আমাদের শ্রমের লাঘব, কম উৎপাদন খরচ, অধিক ফলন, কম অপচয়, বেশি লাভ ও পুষ্ট শস্য দানা উপহার দেয়। কৃষির যান্ত্রিকীকরণ ছাড়া অন্য কোন বিকল্প নেই। হাওর এলাকার ১৬টি উপজেলায় গভীর পানিতে বোনা আমন ধান চাষ হয়। এ সব জলাধান মাছের খাবার ও আশ্রয় যোগায়। ধান চাষের পর এ জমি পতিত থাকে। কিছু কৃষক এ সব জমিতে শুষ্ক মৌসুমে উচ্চ মূল্যের স্বল্পজীবী, অধিক ফলনশীল ধানের জাত উদ্ভাবনের উপর গুরুত্ব দিয়েছে। ধানের চেয়ে ফল, সবজি, মশলা, তৈল ও ডাল জাতীয় শস্য চাষ অধিক লাভজনক। ধানের বীজ উৎপাদনের স্বতন্ত্র প্রকল্প থাকা অপরিহার্য।

আর্থ-সামাজিক ও ভৌগলিক অবস্থা বিবেচনা করে কৃষকদের চাষের পরামর্শ দেয়া হয়। জলবায়ু, ভূমির গঠন, শ্রেণী বিন্যাস করে ভূমির সব প্রকার ব্যবহরের সম্ভাব্যতা যাচাই, জমির উর্বরতা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, সম্পদ, আপদ, বাজার, যোগাযোগ সবকিছু বিবেচনায় নিয়ে ডাটা বেইস করা ও শস্য বিন্যাস করা হচ্ছে। কীটনাশক ব্যবহার কমিয়ে সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পরিবেশ রক্ষা করে ফসল উৎপাদনের উপায় উদ্ভাবনে প্রতি উপজেলা হতে কৃষক নিয়ে কৃষককে প্রশিক্ষিত করা হচ্ছে।

বাংলাদেশের জলাভূমির মারাত্মক সমস্যা এখন দাঁড়িয়েছে সেডিমেন্ট। এটা প্রতিহত করার সক্ষমতা আমাদের নাই তবে ম্যানেজ করার সুযোগ আছে। উজান থেকে ও পাহাড় থেকে পানি নেমে আসে, সাথে নিয়ে আসে সেডিমেন্ট, বছরে এক বিলিয়ন টন সেডিমেন্ট আসায় হাওর, জলাভূমি ও নদীর তলদেশ ভরাট হয়ে যাচ্ছে। এই জলাধারগুলির প্রধান কাজ হলো এলাকার মরুকরণ প্রক্রিয়াকে প্রতিহত করা। একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ মাটি কেটে হাওরের নাব্য সারা বছরের জন্য বাড়ানো যায়। মাটি উত্তোলন করে উন্নয়নমূলক কাজে ব্যবহার করা যায় আবার বিদেশে রপ্তানিও করা যেতে পারে। জলাভূমির নাব্য বাড়াতে পারলে সারা বছর মাছ চাষ করে ৬-৭ গুণ বেশি আয় করা সম্ভব হবে ফলে জিডিপির আকার বড় হবে, একইসঙ্গে সমাজে মানি ফ্লো তৈরি হবে।

হাওরে যে পরিমাণ মাছ চাষ করা সম্ভব তাতে আমাদের মাছের উৎপাদন অনেকগুণ বেশি হবে। পুষ্টি চাহিদা মিটবে এবং মিঠা পানির মাছ রপ্তানিও করা যাবে। হাওর ও জলাশয়ে ১০০ কোটি করচ গাছ লাগানো যেতে পারে। প্রাকৃতিকভাবে রাতারগুল পর্যটন এলাকার ন্যায় সব হাওর রাতারগুল হতে পারে। গাছের গোড়ায় মাছ আশ্রয় নিবে এবং গাছের উপরে পাখি আশ্রয় নিতে পারবে। গাছগুলোর শিকড় বাধ কিংবা মাটি ক্ষয় হতে রক্ষা করে। কার্বন এমিশন ব্যাপকহারে কমে আসবে।

হাওরের মানুষের জীবন মান বাড়ানোর জন্য হাওরের গ্রামগুলোতে প্রটেকশন ওয়াল দিতে হবে সুইডেন মডেলে। গাছ লাগানো থাকবে বাগানের মতো, সোলার সিস্টেম থাকবে পুরো এলাকায়- লোকজন যেন আইটি সাপোর্ট পায়, ওয়াই ফাই ব্যবহার করতে পারে। স্যানিটেশন থাকবে পুরো পরিবারের মতো। খাবার পানি সবার জন্য সহজ লভ্য করতে হবে। বর্ষার দিনে চলাচলে ওয়াক ওয়ে তৈরি করা প্রয়োজন। সাইলো গোডাউন তৈরি করা অতিব জরুরি। মাছ রিজার্ভ করার জন্য স্টোরেজ নির্মাণ করা যেতে পারে।

হাওরের ৩৭টি উপজেলাকে সংযোগ করে ১০০ কিলোমিটার ফ্লাইওভার নির্মাণ করা হলে মানুষজনের মবিলিটি বাড়বে অপরদিকে পর্যটনের বিরাট সম্ভাবনার দুয়ার খুলে যবে। বাংলাদেশে যে পরিবেশ বিরাজ করছে তা মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। বাতাসে কার্বনের মাত্রা বেশি, ধুলাবালি বেশি, শব্দদূষণ বেশি, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা মারাত্মক দুর্বল। এর চেয়ে বেশি খারাপ মানুষের জীবনযাত্রার মান। ভারত, চায়না, নেপাল থেকে সেডিমেন্ট গড়িয়ে এসে আমাদের হাওর ও নদনদী ভরাট করে চলেছে। এজন্য নিয়মিত মাটি ড্রেজিং করে হাওর ও নদনদী সারা বছর নাব্য রাখা প্রয়োজন। মাটিগুলো দেশের উন্নয়নমূলক কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। জলাভূমি এলাকায় কয়েক কোটি গাছ লাগালে পরিবেশের উন্নয়ন ঘটবে। নারীদের জন্য সেলাই প্রশিক্ষণ, হাঁস পালন প্রশিক্ষণ, শুটকি মাছ প্রস্তুতকরণ, পুরুষদের জন্য ইলেকট্রিশিয়ান, ড্রাইভিং, ভাষা শিক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া যেতে পারে।

[লেখক: প্রাবন্ধিক, রিসার্চ ফেলো]